নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১১, পৃ : ১-২৪
© ২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

অর্থনীতি শাস্ত্রের আধিপত্য ও নৃবিজ্ঞান

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন*

> Economism is a form of ethnocentrism.... Economism recognizes no other form of interest than that which capitalism has produced...
>
> *Bourdieu* (1990[1980]:112-113)

> It is our western societies who have recently made man an 'economic animal'. But we are not yet all creatures of this genus.
>
> -*Mauss* (1990[1925]:98)

ভূমিকা

নৃবিজ্ঞানসহ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানকে নানাভাবেই স্বতন্ত্র জ্ঞানকাণ্ড অর্থনীতির প্রবল অবস্থানের মুখোমুখি হতে হয়। একাডেমিক পরিসরের মধ্যে তো বটেই এর বাইরেও অর্থনৈতিক চিন্তা ও মতাদর্শের প্রভাব অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিস্তৃত হয়েছে। এই বিস্তৃতি এতটাই গভীর ও সর্বব্যাপী যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা এটাকে 'স্বাভাবিক' ও প্রশ্নাতীত হিসেবে গ্রহণ করাটাকেই সঙ্গত বলে বিবেচনা করি। কিন্তু "অর্থনীতি জ্ঞানকাণ্ডের এই প্রবল প্রতাপ ও বিস্তৃতির কারণেই এটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চ্যালেঞ্জ করা গুরুত্বপূর্ণ (Carrier and Miller 1999: 26)"। অর্থনীতির নিজের মৌলিক তত্ত্ব ও অনুমানসমূহ এবং সেগুলোর প্রভাবে উৎপাদিত চিন্তা কাঠামোর শ্রেষ্ঠত্ব কীভাবে তৈরি হয়েছে এবং এই শ্রেষ্ঠত্বের ফলাফল কী হয়েছে সেটি জোরালো পর্যালোচনার দাবী রাখে। বস্তুত আমাদের সক্রিয় অস্তিত্বের জন্যই অন্য যে কোনো দাপুটে ব্যবস্থার মতোই চিন্তা ও মতাদর্শের এই ক্ষমতাবান ব্যবস্থাটিরও সতর্ক নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ জরুরী।

অর্থনীতি শাস্ত্র যে বিশেষ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে তারই আদলে আমাদের ভুবনদৃষ্টি ও বোঝাপড়ার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গড়ে ওঠে। অর্থশাস্ত্রীয় তত্ত্বায়ন ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে 'সচেতন' ও 'উদ্বিগ্ন' নীতি-নির্ধারক, বিশ্লেষক, বিশেষজ্ঞ বা সাধারণ মানুষের প্রতিদিনকার কথোপকথন, চিন্তা

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা -১৩৪২।
ই-মেইলঃ mailmnu@hotmail.com

ও চর্চা। গণমাধ্যমের পরিবেশনায় বার বার উঠে আসে অর্থনীতি নির্ধারিত সমস্যা বা ইস্যুসমূহ। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ-আয়োজনে, নীতি ও কর্মকৌশলে, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের এজেন্ডায় যে সকল ভাবনা-চিন্তা, মডেল বা মৌলিক প্রতীতিসমূহের প্রাধান্য দেখা যায় সেগুলো মুখ্যত অর্থনীতি কর্তৃক উৎপাদিত এবং অর্থনীতির এখতিয়ারভূক্ত। সামগ্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পরিকাঠামোর ভেতরে ও বাইরে– উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানতম সামাজিক ও পাবলিক ডিসকোর্সগুলো গড়ে উঠেছে মুখ্যত অর্থনীতিকে ঘিরে। অর্থনীতি-কেন্দ্রিক চিন্তা ও চর্চার এই 'স্বাভাবিক' আধিপত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি করা এবং এসব ব্যবস্থার পেছনের মূলনীতিগুলোর যথার্থতাকে সংহতভাবে চ্যালেঞ্জ করা একান্ত জরুরী।

অন্য এক প্রেক্ষাপটে ইয়ানাগিশাকো ও কলিয়্যার (১৯৮৯) আধিপত্যশীল চিন্তা কাঠামোর সর্বজনীনতাকে প্রশ্ন করার কথা বলছিলেন। প্রতিটি সমাজকে কিছু প্রধান ক্ষেত্রের সমষ্টি হিসেবে দেখাকে একটি স্বাভাবিক ভাবনা হিসেবে পরিবেশন করা হয়েছে– এই ক্ষেত্র-বিভাজনের বিশ্বজনীনতাকে, তাদের মতে, প্রত্যাখ্যান করতে হবে। "আমাদের অবশ্যই খুঁজে দেখতে হবে কোন প্রতিকী ও সামাজিক প্রক্রিয়ার কারণে কোনো একটি সমাজকে দেখতে গেলেই কিছু প্রধান ক্ষেত্রকে দেখা স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়, বা এমনকি একদম 'প্রাকৃতিক' বলে মনে হয়" (Yanagishako and Collier 1989:41)। একই ধরনের তাগিদ থেকে অর্থনীতি পরিবেশিত ও প্রতিষ্ঠিত 'প্রাকৃতিক' বিষয়গুলোর বিশ্বজনীনতাকে প্রত্যাখ্যান করার কথা ভাবা যায়। এগুলোর দাপুটে হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বোঝা জরুরী। এছাড়া দেখা দরকার যে এসব ভাবনা-চিন্তা কী ধরনের সামাজিক চর্চা ও কর্মকাণ্ডের ভেতর থেকে উৎপাদিত হয়েছে এবং এগুলো আবার কোন ধরনের সামাজিক চর্চাকে বৈধতা ও উৎসাহ দেয়। এভাবেই মানব আচরণ ও কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক অর্থনৈতিক স্বতঃসিদ্ধগুলোকে সমস্যায়িত করা যেতে পারে। তদুপরি এই প্রভাবশালী চিন্তাব্যবস্থাকে ভিত্তি করে যে সকল কর্মপন্থা গড়ে ওঠে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন সমাজ প্রেক্ষাপটে কতটা কার্যকর সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে।

অর্থনীতির এই জোরালো আধিপত্য কেন ও কীভাবে সংকটজনক তা স্পষ্ট করার কাজে নৃবিজ্ঞানীগণ যুক্ত হয়েছেন, যদিও তাদের এই যুক্ততা সকল ক্ষেত্রে একই তাগিদ থেকে হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন বোঝাপড়া ও তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে এই কাজে যুক্ত হওয়ার ফলে আধিপত্যকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা দেখা গেছে।

এই ভিন্নতা সত্ত্বেও এটা ঠিক যে, "বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়েই সামাজিক সম্পর্ককে বোঝা ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানসহ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলো অর্থনীতির সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠার চেষ্টা করে গেছে। এখন পর্যন্ত এ লড়াইয়ে অন্য সকল সামাজিক বিজ্ঞান অর্থনীতির কাছে পরাস্তই হয়েছে (Carrier and Miller 1999:24)"। অর্থনীতির এই এগিয়ে থাকা তার 'সহজাত' বা স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয়; বস্তুত কোনো জ্ঞানকাণ্ড বা জ্ঞান ধারাই অতিলৌকিক কোনো প্রাপ্তি নয়। কোনো বিশেষ চিন্তাব্যবস্থার প্রতাপই সহজাত বা 'প্রদেয়' (given) কিছু নয়, বরং সামাজিক চর্চার ফসল এবং সামাজিক চর্চার মধ্যেই এটি প্রতিফলিত।

অর্থনীতি ও নৃবিজ্ঞান: এ লেখার কাঠামো

নৃবিজ্ঞানসহ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তা ও ব্যাখ্যার আধিপত্যকে বিশ্লেষণের যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে মূল ধারার অর্থশাস্ত্রের একটি নৃবৈজ্ঞানিক সমালোচনা দাঁড় করানো এ লেখার উদ্দেশ্য। এ লেখার একটি প্রধান বক্তব্য হলো: অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তার আধিপত্যকে মোকাবেলা করা, এর অন্তর্নিহিত গলদগুলোকে উন্মোচন করা এবং বিকল্প চিন্তা প্রস্তাব করা আজকের নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের একটি প্রধান ক্ষেত্র হবার দাবী রাখে। একাডেমিক অথবা প্রায়োগিক[২] – উভয় ক্ষেত্রেই নৃবিজ্ঞানকে অর্থশাস্ত্রের আধিপত্যের মুখোমুখি হতে হয়। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কাঠামো কী হবে তা নিয়ে বিতর্কের[৩] অবকাশ থাকলেও অর্থনীতি অথবা অর্থনীতি-প্রভাবিত-চিন্তাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে পরিপূর্ণরূপে উন্মোচন করার বিকল্প নেই। এই চেষ্টাকে আপাততঃ 'অর্থনীতির নৃবৈজ্ঞানিক সমালোচনা' (anthropological critique of economics) বা 'অর্থনীতির নৃবিজ্ঞান' (anthropology of economics) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বর্তমান লেখাটিকে এ প্রচেষ্টার একটি সূচনা হিসেবে বিবেচনা করে আমি এখানে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে সামনে আনতে চাই: *এক*, অর্থনীতির আধিপত্য বলতে কী বোঝানো হয় বা এই আধিপত্য কী কী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সেটি সংক্ষেপে উপস্থাপন; ***দুই***, সংকীর্ণ অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও অনুমিতিগুলোকে বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে যেভাবে সমস্যাজনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সেটির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন; *তিন*, অর্থনীতির আধিপত্য বিষয়ে ইতোমধ্যে যে সম্ভাবনাময় সমালোচনাগুলো দাঁড়িয়েছে সেগুলোকে ভিত্তি করে কিভাবে নৃবিজ্ঞান এক্ষেত্রে আরও

সংহত অবস্থান গ্রহণ করতে পারে সেটি প্রস্তাব করার চেষ্টা করা; *চার,* উন্নয়নবাদী চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের প্রধানতম ভিত্তি হিসেবে অর্থনীতিকে চিহ্নিতকরণ ও এর উত্তরাধুনিক সমালোচনাগুলোর পর্যালোচনা; এবং উপসংহারে, বহুধাভিত্তিক জীবন-চর্চার পরিসর তৈরিকরণ এবং বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি প্রদান ও সে লক্ষ্যে সংহত একাডেমিক বিশ্লেষণ দাঁড় করানোর পক্ষে একটি অবস্থান গ্রহণ। বিরাজমান প্রভাবশালী পরিবেশন ব্যবস্থায় যেসব অর্থনৈতিক পূর্বানুমান ও তত্ত্বকে বিশ্বজনীন বলে দেখানো হয় সেগুলোকে সমস্যায়িত করার মধ্য দিয়ে লেখাটি একটি আহ্বানকেও ধারণ করে– মানব প্রকৃতি ও মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্নতা উদযাপনের তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর তৈরির জন্য এ আহ্বান। নানা কৌশলে নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামী 'বাস্তব মানুষ'দের প্রাত্যহিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি সংবেদনশীলতার পক্ষে এটির অবস্থান।

অর্থনীতির আধিপত্য: মৌলিক চরিত্র

অর্থনীতির যে সকল মৌলিক তাত্ত্বিক অবস্থান ও পূর্বানুমানকে সমস্যাজনক বলে বিবেচনা করছি সেগুলোকে এ অংশে সংক্ষেপে চিহ্নিত করা হবে। অন্যভাবে বললে, 'কর্তৃত্বময় অর্থনৈতিক ডিসকোর্স'-এর (এসকোবার ১৯৯৫:১৮) স্বরূপ চিহ্নিত করাই এখানে প্রধান লক্ষ্য। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ফসল হিসেবে মূলধারার অর্থনীতি সেই সভ্যতার প্রধান অভিজ্ঞতাগুলোকে সর্বোচ্চ সাধারণীকরণ (grand generalization) করে এবং ঐ সাধারণীকরণের ভিত্তিতে মানব আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক চর্চা সম্পর্কে শক্তিশালী ও বিস্তৃত বয়ান নির্মাণ করে।

নিও ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি মানব প্রকৃতি বা মানব আচরণকে একটি নির্দিষ্ট সমস্যার অক্ষের ওপর স্থাপন করে এবং এভাবে মানব প্রকৃতির কিছু বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বিত ধারক হিসেবে মানুষ পরিণত হয় অর্থনৈতিক মানুষ (*Homo Oeconomicus*[৩] বা Economic Man)-এ। অর্থশাস্ত্র হচ্ছে এই *হোমো ইকোনোমিকাস*-এর শাস্ত্র। অর্থাৎ, এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে সেই ব্যক্তি-মানুষ ও তার আচরণ যে মানুষ নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অর্থে যুক্তিশীল ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী। নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বাজারের সূত্রগুলো অনুসরণ করে নিজের উপযোগ সর্বোচ্চকরণের জন্য যুক্তিশীলতার সাথে এই ব্যক্তি-মানুষ কাজ করে (Seymour-smith 1986:89)। এই অর্থনৈতিক মানুষের মৌলিক সমস্যাটিই অর্থশাস্ত্রের মৌলিক সমস্যা– এল রবিন্সের বিখ্যাত সংজ্ঞায় যেটা স্পষ্ট

হয়েছে: "বিকল্প ব্যবহার সম্পন্ন সীমিত সম্পদের দ্বারা অসীম অভাব পূরণ করার প্রচেষ্টা হিসেবে মানব আচরণকে অধ্যয়নকারী বিজ্ঞান হচ্ছে অর্থনীতি (Ecionomics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have ulternative uses.)।"

অর্থনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় হলো মানুষের সেসব আচরণ যা স্বল্পতা বা অপ্রতুলতার (scarcity) সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে। বহুবিধ অভাবের মধ্য থেকে কোন অভাবটি পূরণ করা হবে এবং কিভাবে করা হবে তা নিয়ে এই 'যুক্তিশীল' মানুষকে হিশাব-নিকাশ করতে হয়, কারণ তার সম্পদ নিদারুনভাবে সীমিত। বিকল্প ব্যবহারগুলোর মধ্যে কোনো একটি সে নির্বাচন করে এবং অন্যগুলো ত্যাগ করে। এটা সে করে 'সুযোগ ব্যয়' (opportunity cost) এর গাণিতিক বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। সম্পদের ঐ নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবহারই এই যুক্তিশীল অর্থনৈতিক মানুষ করে যেটির মধ্য দিয়ে তার পক্ষে উপযোগ সর্বোচ্চকরণ সম্ভব হয়। কোনো একটি মাত্র প্রয়োজন পূরণে সে সকল সম্পদ ব্যয় করে না, কারণ উপযোগের প্রান্তিকতাবাদ সংক্রান্ত বিচারবোধ তার মধ্যে কাজ করে। এভাবে শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতি উপযোগবাদী ও প্রান্তিকতাবাদী। আর এই শাস্ত্র যে যুক্তিশীল ব্যক্তি-মানুষকে আদর্শ ও স্বাভাবিক হিসেবে বিশ্বজনীনভাবে নির্মাণ করে সে মানুষ সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী, আত্মসুখবাদী (hedonistic), হিসেবী এবং অবশ্যই সারাক্ষণ সম্পদের সীমাবদ্ধতার বোধ দ্বারা তাড়িত, কারণ তার অভাবের কোনো শেষ নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনীতি সমাজ-সংস্কৃতি বা রাজনীতি নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রেই মানুষকে সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে ধরে নেয় এবং এসব মৌলিক পূর্বানুমানের ভিত্তিতে তার বিশ্লেষণ দাঁড় করায়।

বস্তুত রেনেসাঁ, আলোকময়তা, শিল্পবাদ ও পুঁজিবাদী রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সভ্য মানসলোক তার প্রকাশক ও ধারক হিসেবে তৈরি হয়েছে অর্থনীতি শাস্ত্র। আধুনিক অর্থনীতি সে অর্থে আধুনিক ইউরোপের দাপুটে মানসরূপের প্রতিবিম্ব। শিল্পায়িত, যুক্তিশীল, আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ইউরোপে জীবন ও জগত সম্পর্কে যে 'বৈজ্ঞানিক' বোঝাপড়া গড়ে ওঠে তার পুঞ্জীভূত প্রকাশের অন্যতম পথ হিসেবেই গড়ে উঠেছে অর্থশাস্ত্র নামক একাডেমিক-বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থাটি। সে অর্থে সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে অর্থনীতিতেই আধুনিক 'সভ্য' ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে।

মূলধারার অর্থশাস্ত্র পরিবেশিত চিন্তা-ব্যবস্থার ভিত্তিমূলক অনুসিদ্ধান্তগুলোকে এখানে সামনে আনা যায়। এক্ষেত্রে আমি মূলতঃ নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির প্রধানতম পূর্বানুমানগুলোকে সামনে আনব। তবে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রও এসকল পূর্বানুমানের অনেকগুলোকে গুরুত্বপূর্ণভাবে ধারণ করতো। তাছাড়া উন্নয়নবাদ ও 'উন্নয়ন অর্থশাস্ত্রের'-এর সূত্র ধরে যে সমালোচনা সেটি আলাদা আলোচনার বিষয় হিসেবে লেখার পরবর্তী অংশে আসবে। বৃহত্তর অর্থে মূলধারার অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তা-ব্যবস্থার মৌলিক দিকগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়:

এক, মানব আচরণের উপযোগবাদী ও প্রান্তিকতামূলক (utiliterian and marginalist) ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে এই চিন্তা ব্যবস্থার প্রধান অনুমিতি, সূত্র ও বিশ্লেষণগুলো গড়ে উঠেছে। 'যুক্তিশীলতা'র ধারণাকে এই উপযোগবাদিতার সাথে যুক্ত।

দুই, মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে অতি-সাধারণীকৃত কিছু অনুমানের মধ্য দিয়ে মানব আচরণকে নির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করা হয়, যাতে মানুষের বাকী সকল সত্তা অস্বীকৃত বা গুরুত্বহীন হয় এবং *অর্থনৈতিক মানুষ*-এর সংকীর্ণ ইমেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই নির্দিষ্ট ধরনের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের একটি সীমায়িত পরিবেশন ঘটে, যেখানে অর্থনৈতিক মুনাফার জন্য প্রতিনিয়ত সক্রিয় ও স্বার্থপর থাকাটাই হচ্ছে যুক্তিশীল আচরণের প্রধান দিক।

তিন, বস্তুগত অর্জনকে অতীব মহিমান্বিত হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং 'অসীম' অভাবের বোধকে মানুষের চেতনা ও চর্চার মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে দেয়া হয়। সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাব পূরণের অর্থনৈতিক ডিসকোর্স এভাবে সম্পদের সন্ধানে সকল সীমারেখা ভাঙচুর করা আধুনিক যুক্তিশীল মানুষের জন্য বৈধ করে দেয়। বস্তুগত অর্জনকে জীবনে কেন্দ্রীয় গন্তব্য হিসেবে স্থির করার মধ্য দিয়ে অর্থশাস্ত্র পুঁজিতান্ত্রিক ও ভোগবাদী জীবন-দর্শনকে বুদ্ধিবৃত্তিক বৈধতা দেয়।[৪]

চার, উপযোগবাদী ব্যাখ্যায় শেষ পর্যন্ত মানব আচরণকে গাণিতিক হিসাব-নিকাশের বিষয়বস্তুতে পরিণত করা হয় এবং ক্রমশঃ যে মৌলিক ডিসকোর্সটি সামনে আসে তা হলোঃ 'অর্থনৈতিক' (eonomic) লাভের হিসাব-নিকাশ ছাড়া অন্য সব হিসাব-নিকাশ তুচ্ছ। এভাবে ব্যক্তির সমাজ, সংস্কৃতি, আত্মপরিচয়, রাজনীতি প্রভৃতি সত্তাগুলো তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হয় এবং অর্থনীতিবিদের যথাযথ মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে জটিল ও বহুস্তরবিশিষ্ট জীবন ব্যবস্থার সরলীকরণ তাত্ত্বিকভাবে অনিবার্য হয়ে পড়ে।

পাঁচ, স্ব-নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থাকে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে এবং সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির অন্য সব প্রক্রিয়া থেকে বাজারকে সম্পূর্ণ স্ব-শাসিত বা স্বাধীন হিসেবে হাজির করা হয়েছে। বাজারই কার্যত অর্থনৈতিক ডিসকোর্সের প্রধান ধর্ম হয়ে উঠেছে।

ছয়, অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তাব্যবস্থা একান্তই পশ্চিমের (নির্দিষ্ট করে বললে 'আধুনিক' ইউরোপের) অভিজ্ঞতা-জাত হলেও এগুলোকে কঠোরভাবে বিশ্বের সকল সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র ভূমিকা রাখে। প্রশ্নাতীত সত্যের মর্যাদা নিয়ে এগুলো চিন্তা ও চর্চায় প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে মানব আচরণের অন্য সকল ধরণ বা প্রকরণ প্রান্তিক বা প্রায়-অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এমনকি আর্থব্যবস্থা বা 'অর্থনীতি'র (economy) আধুনিক ইউরোপীয় মডেল ছাড়াও যে আরও বহুবিধ মডেল ছিল বা আছে সেগুলো কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। এভাবে বাজার-অর্থনীতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের শিল্পায়িত ও পুঁজিবাদী ইউরোপের সামাজিক সত্য হওয়া সত্ত্বেও সেটি পরিণত হয় (প্রায়) অখণ্ড, বিশ্বজনীন সত্যে।

অর্থনৈতিক চিন্তাব্যবস্থার সমালোচনা

নৃবিজ্ঞান ও অর্থনীতির শাস্ত্র হিসেবে মূল যোগাযোগের জায়গা অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান। নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির ভিত্তিপত্তনকারী মূলনীতিগুলোর সর্বজনীনতা নিয়ে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে একটা সময় তুমুল তর্ক-বিতর্কও হয়েছিল। নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির মূলনীতিকে সকল সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বলে যারা মনে করতেন তারা চিহ্নিত হয়েছিলেন প্রথাগত অর্থশাস্ত্রপন্থী বা ফর্মালিস্ট হিসেবে। এই ধারার অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানীগণ অর্থনীতির মৌলিক অনুমানগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বজনীন হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য কাজ করেছেন (যেমন Schneider 1974, Firth 1966[1946])। এর মধ্যে স্নেইডার যেমন বলেছেন, অর্থনৈতিক আচরণ অধ্যয়ন এথনোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে না হয়ে গাণিতিক-যুক্তিভিত্তিক বিশ্বজনীন মূলনীতির প্রয়োগেই হওয়া উচিত (In the nature of deductive reasoning the approach to the study of economic behavior is not through the ethnographic facts but by means of 'universal principals', logico-mathematical in form, springing from the imagination.) (Schneider 1974: 23)। এখানে বিশ্বজনীন মূলনীতি বলতে অর্থনীতির মূলনীতিগুলোকেই বোঝানো হয়েছে।

এই ফর্মালিস্ট আবস্থানের বিপরীতে প্রতিটি সমাজের ক্ষেত্রে মানুষ ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার আন্তঃসম্পর্ককে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখার ওপর জোর দিয়েছিল সাবসটেন্টিভিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি। মূলতঃ অর্থশাস্ত্রের কেন্দ্রীয় যুক্তিশীলতার ধারণাকে সর্বজনীন বলে মনে করার বিরোধিতা করেছিলেন এ ধারার তাত্ত্বিকগণ। বিগত শতকের ষাটের দশক জুড়ে এই বিতর্কটি তীব্রতর পর্যায়ে যায়, যে কারণে সাধারণভাবে মনে করা হয় এই সময়ই প্রথম নৃবিজ্ঞানীগণ অর্থনৈতিক পূর্বানুমানগুলোর অপ্রতুলতা দেখাতে শুরু করেন। বস্তুত এই বিতর্কের বাইরেও অর্থনৈতিক মতাদর্শের প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করার প্রয়োজন নৃবিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করেছেন। এই বিতর্কটি বরং বিষয়টিকে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিল। বিশেষ করে সাবসটেন্টিভিস্ট ধারার তাত্ত্বিকগণ শিল্পায়িত সমাজের ব্যাখ্যায় অর্থনীতির তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে যথেষ্ট বলে মনে করার মধ্য দিয়ে অর্থনীতি জ্ঞানকাণ্ডকে পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষার মুখে দাঁড় করানোর সুযোগ হাতছাড়া করেন। বস্তুত পুঁজিবাদী-অপুঁজিবাদী নির্বিশেষে সকল সমাজের ক্ষেত্রেই নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে– এই বিশ্লেষণটি অনেক বেশি জোরালোভাবে সামনে আনার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া, ফর্মালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির সর্বজনীনতাকে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে যেয়ে সাবসটেন্টিভিস্টরাও আসলে এক ধরনের সর্বজনীন তত্ত্বেরই সন্ধান করেন (Gudeman 1986)।

কার্ল পোলানির কাজের (Polanyi 1957) মধ্য দিয়ে উল্লিখিত বিতর্কটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করলেও পোলানির অবদানকে কেবলমাত্র এই বিতর্কের পরিসরে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন হয় না। বিশেষ করে পশ্চিমের বাজার মানসিকতার যে সমালোচনা তিনি দাঁড় করান (Polanyi 1971[1944]) সেটি তাত্ত্বিকভবে পরবর্তী বহু বিশ্লেষককে অনুপ্রাণিত করেছে। পোলানির কাজের সব থেকে বড় দিক হলো এটা দেখানো যে, স্ব-নিয়ন্ত্রিত বাজার (self regulatory market) 'বিশ্বমানবে'র সহজাত বা স্বাভাবিক কোনো প্রাপ্তি নয়, বরং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপ এটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করে। "দি গ্রেট ট্রান্সফরমেশন: দি পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনোমিক অরিজিনস অব আওয়ার টাইম" শিরোনামের তার অত্যন্ত আলোচিত কাজটি (1971[1944]) বস্তুত স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার-এর ইতিহাস। তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী সব ধরনের সমাজই অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ যে অর্থে অর্থনৈতিক সেটি অন্য সকল সমাজ থেকে একদমই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এ পর্যায়ে ইউরোপে যে মোটিভটিকে সমগ্র ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে

গ্রহণ করা হলো সেটি ইতোপূর্বে আর কখনো এতটা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সামনে আসেনি– লাভ বা মুনাফা (gain) হলো এই মোটিভটির নাম। এই মুনাফাকে কেন্দ্র করে স্থাপিত কার্যব্যবস্থা এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে এর উন্মাদনা ও কার্যকরিতাকে কেবলমাত্র ইতোপূর্বেকার ধর্মীয় উন্মাদনার সাথেই তুলনা করা যায় বলে পোলানি মন্তব্য করেন।

মানুষকে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক যুক্তিশীলতার মধ্যে আবদ্ধ হিসেবে দেখবার যে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি তাকে সম্পূর্ণরূপে 'স্বজাতিকেন্দ্রিক' হিসেবে দেখানোর প্রথম নৃবৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব অবশ্য ব্রনিসল ম্যালিনোস্কির। ট্রবিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের কুলা বিনিময় প্রথা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি পশ্চিমা অর্থশাস্ত্রের মৌলিক অনুমানগুলোর অপ্রতুলতা স্পষ্ট করেন। এ ধারার বিশ্লেষণকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যান মার্সেল মস। তাঁর 'উপহার' সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনাকে এ ক্ষেত্রে সব থেকে গভীর ও সুদুরপ্রসারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রান্তিকতাবাদী অর্থনীতির 'উপযোগ সর্বোচ্চকরণ' সংক্রান্ত বিশ্লেষণের বিপরীতে বিভিন্ন 'আদিম' ও প্রাচীন সমাজের বিস্তারিত বিশ্লেষণের ওপর ভর করে মস বলেন, প্রতিটি সমাজেই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক শক্তি হিসেবে এমন সব বিষয়াদি রয়েছে যেগুলোকে কেবল উপযোগ বলে বোঝা যায় না। এমনকি পশ্চিমা অর্থে আলোকদয় ঘটেছে এরকম বহু সমাজও কেবলমাত্র উপযোগবাদী হিসাব-নিকাশ দ্বারা চালিত হয় না (Mauss 1990 [1925]:92)।

মস তার শক্তিশালী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জোরালো যুক্তি দেন যে, কোনো মানব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পশ্চিমা সমাজের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গিই শেষ কথা নয়। পশ্চিমের স্বজাতিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্বিচার সর্বজনীন প্রয়োগ কেবল বিভ্রান্তিকর নয়, বরং তারও চেয়ে ভয়ঙ্কর হতে পারে।

উপহার (present and gift) সংক্রান্ত আলোচনায় মসের মুখ্য তাত্ত্বিক অবদান হলো লেনদেন যে কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং আরও জটিল একটি বিষয় সেটি দেখানো। স্বার্থপরতাকে অর্থশাস্ত্রে যেভাবে সাধারণীকরণ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করে তিনি বলেন অন্য সব সভ্যতার (আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা ছাড়া) লোকেরাও তাদের নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবেছেন কিন্তু আমাদের যুগে আমরা যেভাবে ভাবি তাদের স্বার্থ-ভাবনাটি সেরকম ছিল না। তিনি দেখান 'স্বার্থ'

(interest) শব্দটাই সাম্প্রতিক আবিষ্কার। মানুষ এমন বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও ঘটনা দ্বারা পরিচালিত হয় যেগুলো কোনোভাবেই অর্থনৈতিক যুক্তিশীলতার সূত্র মেনে চলে না।

মস বলেছেন, "আমাদের পশ্চিমা সমাজে আমরা মানুষকে 'অর্থনৈতিক প্রাণী'তে পরিণত করেছি এবং সেটা করা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। কিন্তু এখনো যে আমরা সকলে সকল অর্থে এই 'গণ' ভুক্ত হয়েছি তা নয়। আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষজন বা অভিজাত শ্রেণী সবার মধ্যেই সুস্পষ্ট অযৌক্তিক ব্যায়ের চর্চাটা সচরাচরই দেখা যায়।" তিনি আরও বলেন মানুষ আসলে একটা দীর্ঘ সময় জুড়েই ভিন্ন কিছু ছিল; তার যন্ত্রে পরিণত হওয়া অথবা জটিল হিসাব-নিকাশের যন্ত্র হয়ে ওঠা খুব বেশি দিন আগে ঘটেনি। "স্থির, হিমশীতল উপযোগবাদী ক্যালকুলাস থেকে আমরা এখনও অনেকখানি দূরে আছি, এই দূরে থাকাটা সুখেরই (Mauss 1990 [1925]:98)।"

মসের মতে, পশ্চিমা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোগ ও ব্যয়ের হিসাব নিলে দেখা যাবে তারা যা কিছু করে সেগুলো কেবলমাত্র উপযোগ পূরণের জন্য নয়। বিলাস, শিল্পকলায় ব্যয়, নীতিবহির্গত খরচাদি, চাকর-বাকদের পেছনে ব্যয় এগুলোকে ঠিক উপযোগবাদী অর্থনীতির যুক্তিশীলতার আওতায় ফেলা যায় না। তিনি আরও মন্তব্য করেন, "এটা সম্ভবত ভালোই যে বিশুদ্ধ ব্যয় ছাড়াও খরচের বা বিনিময়ের আরও কিছু পথ আছে।" শুধু তা-ই নয় আরও অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন, "আমাদের মত হলো একটি সর্বোচ্চ অনুকূল অর্থনীতির পদ্ধতি একক ব্যক্তির প্রয়োজন বিষয়ক হিসাব-নিকাশের ওপর ভিত্তি গড়ে উঠবে না (In our view, however, it is not the calculation of individual needs that the method of an optimum economy is to be found) (Mauss 1990 [1925]:98)।" – এভাবে তিনি মূলধারার অর্থশাস্ত্রের বুনিয়াদি চিন্তাগুলোর সীমাবদ্ধতাকে সামনে আনেন। তিনি ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের পেছনে ছোটাছুটিকে পশুতুল্য বলেছেন, যেটি কিনা, তার মতে, সবার প্রয়োজন ও শান্তির জন্যই ক্ষতিকর। কাজ ও আনন্দের ছন্দকে এটা ক্ষতিগ্রস্ত করে– আর ব্যক্তির নিজের জন্যও ভালো পরিণাম আনে না।

অর্থনীতির 'উৎপাদন-কেন্দ্রিক' ব্যাখ্যায় অতি-বস্তুবাদিতার সমালোচনার মধ্য দিয়ে মূলধারার অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তার ও অর্থনীতির একটি পরিপূর্ণ সমালোচনা দাঁড় করান সুজান নারোৎস্কি (Narotzsky 1997)। নারোৎস্কির বিশ্লেষণ মতে, মানুষের

বস্তুগত জীবনকে তাত্ত্বিকভাবে তার সাংস্কৃতিক প্রকাশ থেকে আলাদা করা যায় না। বস্তুত সাংস্কৃতিক ও বস্তুগত পরস্পর গভীরভাবে গ্রথিত। 'সামাজিক পুনরুৎপাদন'কে তিনি কেন্দ্রীয় বিষয় বলে বিবেচনা করেন এবং বলেন সামাজিক পুনরুৎপাদনের সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে উৎপাদনের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে দেখতে হবে– বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই।

তাত্ত্বিকভাবে খানিকটা ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে (মার্ক্সবাদ ও নব্য-মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক বিতর্কের জায়গায়) হলেও মরিস গডেলিয়ার অর্থনৈতিক ভৌতকাঠামোর ওপর অধিক গুরুত্বারোপের ও 'স্থূল অর্থনীতিবাদ' (vulger economism)– এর যে সমালোচনা করেন তার মধ্য দিয়েও অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ তথা, অন্যভাবে বললে, অর্থশাস্ত্রের আধিপত্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা চিন্তা-ব্যবস্থার সংকটগুলোই সামনে আসে (Godelier 1977[1973])।

প্রাত্যহিক চর্চা বা অনুশীলনকে তত্ত্বায়িত করতে যেয়ে 'অর্থনীতিবাদে'র সীমাবদ্ধতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন পিয়েরে বুঁর্দো। তিনি দেখান যে মানুষের জীবনের চর্চাকে (practice) বুঝতে গেলে পুঁজিবাদ কর্তৃক উৎপাদিত বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির ব্যাখ্যাগুলো বরং এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে– মানুষ যে বিচিত্র ধরনের বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় ও বিভিন্ন ধরনের 'স্বার্থ' বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হয় সেগুলো পর্যাপ্তরূপে ব্যাখ্যা করার জন্য মূলধারার অর্থনীতিবাদ যথেষ্ট নয়। কারণ, তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "অর্থনীতিবাদ এক ধরণের স্বজাত্যবাদ" (Economism is a form of ethnocentrism)।

পিয়েরে বুঁর্দোর বিবেচনায় সামাজিক জগতকে পুঞ্জিভূত ইতিহাস হিসেবে দেখা যেতে পারে ... social world can be viewed as accumulated history। এই ইতিহাসকে যথাযথরূপে বুঝতে হলে 'পুঁজি'র ধারণাকে একটি মূল ধারণা হিসেবে ব্যবহার করা প্রয়োজন ও আনুষঙ্গিক ধারণা হিসেবে পুঞ্জিভবনের ধারণাকে সামনে আনাও জরুরী। ব্যক্তি সামাজিক জগতে একজন কৌশলী লড়িয়ে বা খেলোয়াড়– মূল্য, মুনাফা প্রভৃতি বোধের উপর ভিত্তি করে সে তার কৌশল ঠিক করে। পুঁজি ব্যক্তিক জীবনে যেমন প্রভাব রাখে তেমনি নৈর্ব্যক্তিক কাঠামোতেও এই পুঁজির শক্তি প্রতিফলিত হয়। এই পুঁজির কারণেই সামাজিক খেলাটা আর সম্পূর্ণ ভাগ্য- বা দৈব-নির্ভর বিষয় হয়ে থাকে না; অর্থাৎ সাফল্য কেবল দৈবক্রমে আসে না– পুঁজির ফলাফল হিসেবেই আসে। অবশ্য এর জন্য পুঁজিকে একটা নির্দিষ্ট

উপায়ে ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়, পুঁজির লাভজনক হয়ে ওঠার জন্য এর নানা ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়।

বুঁর্দো যদিও পুঁজির ধারণাকে ব্যবহার করলেও অর্থনৈতিক বাজার ব্যাখ্যায় পুঁজির ধারণা সাধারণত যেভাবে প্রয়োগ করা হয় তিনি তা করতে চাননি। বরং মূলধারার অর্থনীতিতে বাজার ভিত্তিক পুঁজির যে যুক্তিসমূহ সেগুলোর একদম বিপরীত অবস্থান থেকেই তিনি 'সামাজিক পুঁজি', 'সাংস্কৃতিক পুঁজি', 'প্রতীকী পুঁজি' প্রভৃতি ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বাজারভিত্তিক ধারণায়নে পুঁজির ধারণাকে সংকুচিত করে ফেলা হয়, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে সংকীর্ণভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং শিক্ষা, শিল্প, গতানুগতিক সামাজিক চর্চা প্রভৃতি বিষয়ের সাথে যুক্ত চিন্তাকে 'স্বার্থহীন' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বুর্দোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোঃ কেবল সংকীর্ণ অর্থে পুঁজিকে না দেখে সকল ধরনের পুঁজির বিষয়েই তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণগত দিক থেকে সুবিচার করা উচিত। এসব পুঁজির যে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ রয়েছে তার সবগুলোকেই যথেষ্ট তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণী গভীরতার সাথে দেখা উচিত, কোনোভাবেই পুঁজির ধারণাকে অর্থনৈতিক তত্ত্বে যেভাবে সংকুচিত অর্থে উপস্থাপন করা হয়েছে শুধু সেখানে দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়।

বিশেষ করে 'প্রতীকী পুঁজি' সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন এ ধরনের পুঁজি প্রাত্যহিক জীবন চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ গতানুগতিক অর্থশাস্ত্রের 'স্বার্থ', 'লাভ', 'যুক্তিশীলতা' প্রভৃতির মানদণ্ডে দেখলে এটিকে সম্পূর্ণই গুরুত্বহীন মনে হতে পারে। কিন্তু প্রতীকী পুঁজি বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সত্য। বুঁর্দোর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, "অর্থনীতিবাদ কেবলমাত্র পুঁজিবাদ উৎপাদিত স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থকে দেখে না " (Bourdieu 1990:113)।

অর্থনৈতিক তত্ত্বের মৌলিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বুঁর্দোর সমালোচনা স্পষ্ট হয় যখন তিনি বলেন, "Economic theory which acknowledges only the rational 'responses' of an indeterminate, interchangable agent to 'potential opportunities', or more precisely to average chances (like the average rates of of profit offered by different markets), converts the immanent law of the economy into a uninversal norm of proper economic behavior." তিনি বলেন অর্থনৈতিক তত্ত্বের এই সাধারণীকরণের ফলে এটা আর দেখা সম্ভব হয় না যে, প্রতিটি অর্থনৈতিক আচরণ এক একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে

উৎপাদিত হয়, যা আবার স্থির হয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজির অধিকারী হওয়ার মধ্য দিয়ে। প্রতিটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি যে আলাদা সেটি বিবেচনায় নেয়ার সুযোগ অর্থনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে থাকে না।

যুক্তিশালী মানব আচরণ সংক্রান্ত যেসব মৌলিক অনুমানকে ভিত্তি করে অর্থশাস্ত্র তার প্রধান তত্ত্ব ও মডেলসমূহ দাঁড় করায় সেগুলোকে সাংস্কৃতিক নির্মাণ হিসেবে দেখানোর ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক দশকগুলোয় যেসব কাজ হয়েছে তার মধ্যে খুবই শক্তিশালী বিশ্লেষণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় স্টিফেন গুডম্যান-এর কাজকে (Gudeman 1986)। ল্যাটিন আমেরিকার কৃষকদের জীবন-জীবিকার উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখান বাজার ব্যবস্থা যে আইন বা সূত্র দ্বারা পরিচালিত হয় কৃষকদের জীবন সেই একই যুক্তিশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয় না। যুক্তিশীলতার প্রতিটি ব্যবস্থাই একেকটি স্থানীয় মডেল – বিশ্বজনীন মডেল নয়। তাঁর দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি – ফর্মালিস্ট, সাবসটেন্টিভিস্ট, মার্ক্সিস্ট – প্রত্যেকটিই, চূড়ান্ত বিচারে, বিশ্বজনীন মডেলের খোঁজ করে (Gudeman 1986)। এর বিপরীতে তিনি সামাজিক আচরণ ও কর্মকাণ্ডের স্থানীয় মডেলকে দেখার ওপর জোর দেন। কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে জীবিকা অর্জনের প্রক্রিয়া নানা ধরনের সাংস্কৃতিক উপায়ের মধ্য দিয়ে নির্মিত (..the process of gaining livelihood is culturally constructed in diverse ways)। সে কারণে সংস্কৃতি নির্বিশেষে বিশ্বজনীন একটি মডেলকে আরোপ করার কোনো সুযোগ নেই। পশ্চিমা অর্থশাস্ত্রের মডেলগুলো সত্য অথবা মিথ্যা সেটি, তাঁর বিবেচনায়, প্রধান বিষয় নয়; কারণ নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এগুলোর ব্যবহার অবশ্যই রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে *এই পশ্চিমা মডেলগুলো নিজেরাই আসলে সাংস্কৃতিক নির্মাণ*; সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এসব পশ্চিমা মডেল বা সেগুলোর অনুসারী মডেলগুলো কোনো অখণ্ড, অভিন্ন বা আর্কিমিডিশিয়ান অবস্থানের দিশা দেয় না (Gudeman 1986: 29)।

অর্জুন আপ্পাদুরাই (১৯৮৬) সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে পণ্যকে বুঝতে চেয়েছেন (commodites in cultural perspective) এবং সেক্ষেত্রে সমাজের যে বিষয়গুলোকে নিছকই 'অর্থনীতি' বলে পরিবেশন করা হয় সেগুলোরও যে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন (...to restore the cultural dimensions to soiceties that are too often represented simply as economies writ large)।

এসকল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী পরিসরের বাইরে 'প্রায়োগিক' বা 'ব্যবহারিক' ক্ষেত্রেও শাস্ত্র অর্থনীতির শক্তিশালী অবস্থানের মুখোমুখি হতে হয় নৃবিজ্ঞানসহ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানকে। এ ধরনের মুখোমুখি হওয়ার একটি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে গবেষণা পদ্ধতিবিদ্যা। প্রাত্যহিক জীবনের কথোপকথন, গণমাধ্যমের উপস্থাপনা কিংবা সরকারী-বেসরকারী নীতি ও কর্মকৌশলে যেসকল শব্দমালা, কথোপকথন, পদ-প্রত্যয়-ধারণা, ক্যাটিগরি, সূচক, সমীকরণ বা মানদণ্ড বার বার উঠে আসে সেগুলো মুখ্যত পরিমাণগত ও পরিসংখ্যানমূলক। এসকল সূচক বা সমীকরণ নির্ণীত হয় প্রধানত অর্থশাস্ত্রের অনুমান ও তত্ত্বসমূহকে ভিত্তি করে। বিশেষত 'সমস্যা' কী সেটিই যেখানে নির্ধারিত হয় অর্থশাস্ত্রীয় অনুমানের উপর ভিত্তি করে সেখানে এটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে যে, ঐ সমস্যাসমূহের অধ্যয়নে বা সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য পরিচালিত গবেষণায় পদ্ধতিবিদ্যা হিসেবে এই শাস্ত্র অনুমোদিত পদ্ধতিতত্ত্বই আধিপত্য করে এবং অন্যান্য শাস্ত্রগুলো প্রান্তিক শাস্ত্রে পর্যবসিত হয়। এ সমস্যারও বিভিন্নমুখী প্রকাশ রয়েছে। প্রণব বর্ধন (১৯৮৯) প্রমুখদের কাজের মধ্য দিয়ে সামনে এসেছে নৃবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যকার 'বিশাল পদ্ধতিতাত্ত্বিক ব্যবধান'-এর বিষয়টি। অর্জুন আপ্পাদুরাই (১৯৮৯) নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার বৃহৎ পর্যায় ও ক্ষুদ্র পর্যায়ের বিশ্লেষণের সমস্যা (anthropological gap between large- and small-scale analyses) নিয়ে কথা বললেও তিনি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন সমস্যাটি আরও গভীর। তাঁর দৃষ্টিতে বিষয়টি জ্ঞানতাত্ত্বিক, এটি কেবল সংখ্যাতাত্ত্বিক উপস্থাপনার যথার্থতার প্রশ্ন নয়, অথবা গুণগত বনাম পরিমাণগত গবেষণার বিতর্কও নয়।

প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রীয় আধিপত্য কেবল পদ্ধতিবিদ্যাগত নয়। বস্তুত বর্তমান বাজার-ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার অর্থনীতিই হলো দাপ্তরিক শাস্ত্র বা 'অফিসিয়াল ডিসকোর্স'। পেশাগত ক্ষেত্রে অর্থনীতির দাপটে অন্য সব সামাজিক বিজ্ঞান বহু ক্ষেত্রেই প্রান্তিক বিষয়ে পরিণত হয়। প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানের এই প্রান্তিকতার টানাপোড়েন নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণও তৈরি হয়েছে (যেমন Escobar 1995; Gardner and Lewis 1996; Grillo 1985)|

উন্নয়নবাদের উত্তরাধুনিক সমালোচনাঃ কাঠগড়ায় অর্থনীতি

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল মানুষের জীবনে এসকল অর্থনৈতিক পূর্বানুমানগুলোর শক্তিশালী প্রভাবকে নৃবিজ্ঞানীগণ (ও অন্যান্য

বিশ্লেষকগণ) দেখতে পান 'উন্নয়ন'-এর সাথে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে, 'উন্নয়ন' অধ্যয়ন করতে যেয়ে। উন্নয়নের নীতি, কর্মসূচী ও তাত্ত্বিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারা দেখেন এগুলো মুখ্যত যে বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে বুনিয়াদের অস্তিত্ব সম্ভবপরই হয় কেবলমাত্র অর্থশাস্ত্রের শক্তিশালী অবস্থানের কারণে (Escobar 1995, Esteva 1992)। বিশেষ করে বিগত শতকে আশি-এর দশকের শেষে এবং নব্বুই-এর দশকে এসে ফুকোল্ডিয়ান বিশ্লেষণ দ্বারা অনুপ্রাণিত বিশ্লেষকগণ উন্নয়নকে ডিসকোর্স হিসেবে দেখতে যেয়ে অর্থনৈতিক চিন্তাগুলোকে দেখেছেন উন্নয়নবাদী চিন্তা ও চর্চার বুনিয়াদ হিসেবে। উন্নয়ন প্যারাডাইমগুলোর ঠিকুজি খুঁজতে গিয়ে তারা দেখতে পান এক্ষেত্রে উন্নয়ন অর্থশাস্ত্রের মৌলিক অনুমানগুলো নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের গত্যন্তর নেই। আবার উন্নয়ন অর্থশাস্ত্রকে বুঝতে গেলে মূলধারার অর্থশাস্ত্র ও তার ভিত্তিমূলক চিন্তা-ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হয়, দেখতে হয় এই নির্দিষ্ট ধরনের প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রেক্ষিত ও প্রক্রিয়া। এভাবে তারা অর্থনীতি জ্ঞানকাণ্ডকে পশ্চিমা সামাজিক চর্চার অঙ্গীভূত বিষয় হিসেবে দেখেন (Hill 1986, Escobar 1995, Rahnema 1997, Esteva 1992, Shiva 1992, Gudeman 1986)। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক দশকগুলোকে অর্থশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্রীয় মূলনীতিগুলো অধিক পরিমাণে অভিযুক্ত হয়েছে উন্নয়নবাদী ডিসকোর্সের সমালোচনার সূত্র ধরেই। এসকোবার যেমন মন্তব্য করেছেন উন্নয়ন অর্থশাস্ত্র আসলে মূলধারার ক্ল্যাসিক্যাল ও নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রেরই সম্প্রসারণ ((a)s originally fomulated, development economics was an outgrowth of classical and neoclassical economics) (Escobar 1988:432)।

অর্থনীতির এই আধিপত্যকে যদি পশ্চিমা চিন্তা ও চর্চার আধিপত্য হিসেবে দেখা হলে সেটি নৃবিজ্ঞানের জন্য সম্পূর্ণ স্বস্তিদায়ক হয় না। কারণ, এভাবে দেখলে গেলে একাডেমিতে 'স্বাভাবিক' বা 'সত্য' বলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাগুলোর এই শ্রেষ্ঠতর অবস্থানের সাথে ক্ষমতা কাঠামোর যোগাযোগকে প্রধান দ্রষ্টব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, যেটি করার জন্য নৃবিজ্ঞান সব সময় আগ্রহী ছিল না। পশ্চিমা আধিপত্য ও পশ্চিমা জ্ঞানের সহ-সম্পর্ক দেখার তুলনায় বরং বহু পশ্চিমা জ্ঞান ও পরিবেশনের স্বাভাবিকীকরণে নৃবিজ্ঞানও ভূমিকা রেখেছে, যেমন "আধুনিক অর্থশাস্ত্রের যৌক্তিকীকরণে নৃবিজ্ঞানীরা ভূমিকা রেখেছে" (Escobar 1995:61)। আধুনিকতার সাথে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক অবশ্য নানা ধাপ পেরিয়ে এসেছে এবং এই সম্পর্কের সাম্প্রতিক ধাপে এসে নৃবিজ্ঞানীগণ এখন মনে করছে 'আধুনিকতা'কেই তাদের গবেষণা বা 'এথনোগ্রাফিক' অধ্যয়নের বিষয়বস্তু করাটা তাদের কর্তব্য

(...modernity as an ethnographic object) (Spencer 1996)। স্পষ্টতঃই, উত্তরাধুনিক নৃবিজ্ঞানীগণ আধুনিকতাকে এবং আধুনিকতার ভিত্তিমূলক ব্যবস্থাগুলোকে বিনির্মাণের (deconstruct) যে উদ্যোগ নেন এটি তারই এক ধারাবাহিকতা। মুখ্যতঃ মিশেল ফুকোর তত্ত্বায়ন দ্বারা অনুপ্রাণিত এ ধারার কাজে জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্পর্ক বোঝা এবং প্রবল চিন্তা ব্যবস্থাগুলোর গড়ে ওঠার রাজনৈতিক ইতিহাসকে বিশ্লেষণের ওপর জোর দেয়া হয়।

ফুকোল্ডিয়ান ধারায় গড়ে ওঠা এই বিশ্লেষণী অবস্থান অনুসারে ইউরোপের প্রেক্ষাপটে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবস্থা ও নির্দিষ্ট চিন্তা ব্যবস্থার অন্তর্প্রবিষ্টতার মধ্য দিয়ে অর্থনীতির আধিপত্য বলবৎ হয় ও পরে সেটা দুনিয়া জোড়া প্রতাপশালী হয়। উল্লেখযোগ্য কিছু সীমাবদ্ধতা থাকার পরও অর্থনীতির মূল অনুমিতিগুলোর তীব্র স্বজাতিকেন্দ্রিকতা এবং রাজনীতি ও ক্ষমতাসংলগ্নতা উন্মোচনের ক্ষেত্রে এ ফ্রেমওয়ার্কের ব্যবহার নিজের কার্যকরিতা প্রমাণ করেছে।

ফুকোর অনুসরণে এসকোবার যখন 'আধুনিকতার নৃবিজ্ঞান' এর পক্ষে জোর দেন এবং বলেন আধুনিকতার নৃবিজ্ঞান আসলে *হোমো ইকোনোমিকাস*-এর নৃবিজ্ঞান তখনই অর্থনৈতিক মূলনীতিগুলোকে জোরালোভাবে চ্যালেঞ্জ করার বিষয়টি সামনে চলে আসে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক চর্চায় বিরাজমান প্রবল চিন্তাব্যবস্থাকে বোঝার ক্ষেত্রে ফুকোর 'রেজিম অব ট্রুথ' সংক্রান্ত বিশ্লেষণকে মূল তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে।

ক্ষমতা-ব্যবস্থার সাথে সত্যের সম্পর্কটা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মিশেল ফুকো বলেন এক বৃত্তাকার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সত্য যুক্ত থাকে ক্ষমতা ব্যবস্থার সাথে, যে ক্ষমতা ব্যবস্থাই সত্যকে উৎপাদন করে ও টিকিয়ে রাখে। সত্যে যুক্ত থাকে ক্ষমতার প্রভাবের সাথেও। সত্যের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার প্রভাব উৎপাদিত হয়, আবার এ প্রভাবের ওপর ভর করে সত্যের সম্প্রসারণও ঘটে। এভাবে তৈরি হয় সত্যের এক নিজস্ব ব্যবস্থা, সত্যের নিজের এক শাসন-নিয়ন্ত্রণ-আধিপত্যের পদ্ধতি – 'রেজিম অব ট্রুথ' (a regime of truth)। এই 'রেজিম অব ট্রুথ'-ই, ফুকোর মতে, বুদ্ধিজীবীদের কাজ করার প্রধান জায়গা - তাদের জন্য প্রধান সমস্যা। তিনি বলেন রাজনীতি, অর্থনীতিও প্রাতিষ্ঠানিকতার যে বিরাজমান ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সত্য উৎপাদিত হয় সে ব্যবস্থা বা পদ্ধতিই (the political, economic, institutional regime of the production of truth) হলো মূল সমস্যা; সেটিকে এমনভাবে মোকাবেলা করা প্রয়োজন যাতে কিনা *সত্যের নুতন রাজনীতি*র উদ্বোধন ঘটানো সম্ভব হয়।

সত্য ও ক্ষমতার সম্পর্ক এবং 'ট্রুথ রেজিম' সংক্রান্ত ফুকোর এ প্রস্তাবনাগুলোকে অর্থনীতির সত্যগুলোর কর্তৃত্বময় হয়ে ওঠাকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে প্রধান তাত্ত্বিক যাত্রাবিন্দু হতে পারে এই: অর্থশাস্ত্রের চিন্তা, তত্ত্ব, অনুমান, মডেল প্রভৃতির আধিপত্যশীল হয়ে ওঠাটাকে দেখতে হবে অর্থনৈতিক সত্যের আধিপত্য হিসেবে। একে আমরা সংক্ষেপে চিহ্নিত করতে পারি 'অর্থনৈতিক সত্যের রেজিম' হিসেবে। অর্থনীতির সত্যগুলো কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উৎপাদিত হয় এবং ঐ ক্ষমতা ব্যবস্থার পরিপোষক হিসেবে কীভাবে এই কাজ করে যায় সেটি হবে বিশ্লেষণের কেন্দ্রীয় বিষয়। অথনৈতিক সত্যগুলোকে এবং সেসব সত্যের দাপটকে পশ্চিমা ক্ষমতা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করে দেখাটা যে আজকের নৃবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হতে পারে সেই অবস্থানের ক্ষেত্রে অন্যতম অনুপ্রেরণদায়ী হচ্ছে পল রাবিনাউ (1986) এর বিশ্লেষণ। ফুকোর 'রেজিম অব ট্রুথ' সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও অন্যান্য লেখার মধ্যে চিন্তা বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার দেখতে পান রাবিনাউ। তাঁর মতে এ অবস্থান থেকে দেখার মধ্য দিয়ে চিন্তাকে একটি সামাজিক ও পাবলিক অনুশীলন হিসেবে (...thought as a public and social practice) দেখা সম্ভব হয়, যেভাবে দেখাটা খুবই জরুরী। তিনি ফুকোর বরাত দিয়ে স্পষ্ট করেই বলেন সত্য কেবলমাত্র মতাদর্শিক নয়, কিংবা কেবলমাত্র উপরিকাঠামোগতও নয় - সত্য পুরো ব্যবস্থার মাঝে গ্রথিত; সত্যকে দেখতে হবে পুরো ব্যবস্থার অংশ হিসেবে।

ফুকোর এ বিশ্লেষণ অনুসরণ করে রাবিনাউ কিছু সুনির্দিষ্ট করণীয় এবং গবেষণা পদ্ধতি প্রস্তাব করেন। এক্ষেত্রে তার অন্যতম প্রস্তাবনা হলো: *পশ্চিমের নৃবৈজ্ঞানিকীকরণ*। তাঁর ভাষায়, "We need to anthropologize the West"। পশ্চিমের নৃবৈজ্ঞানিকীকরণ বলতে কী বোঝাতে চান সেটি তিনি সংক্ষেপে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে এক্ষেত্রে মূল করণীয় হলো: বিরাজমান বাস্তবতাকে পশ্চিম কিভাবে নির্মাণ করেছে তা উন্মোচন করা, পশ্চিম কর্তৃক বাস্তবতার এই নির্মাণ যে কতটা অদ্ভুত, কতটা একান্তই তাদের মত সেটি দেখা; যে বিষয়গুলোকে বা যে ক্ষেত্রগুলোকে প্রায় প্রশ্নাতীতভাবে বিশ্বজনীন বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেগুলো যে আদতে কত বেশি পশ্চিমা সেটি সবিস্তারে দেখানো। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো বিশ্বজনীন অখণ্ড সত্য বলে উপস্থাপিত বাস্তবতাগুলোকে একদমই নির্দিষ্ট ইতিহাসের ফসল হিসেবে দেখানো। সত্যের নির্মাণ নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা সংলগ্ন। যে সত্যেগুলোকে পশ্চিম বিশ্বজনীন বলে দাবী করে সে সত্যগুলো বস্তুত একান্ত নিবিষ্টভাবে পশ্চিমের নিজস্ব সামাজিক চর্চার মাঝে গ্রথিত; সামাজিক চর্চা

থেকে উদ্ভূত এসব সত্য আবার সক্রিয় ভূমিকা রাখছে সামাজিক জগতেই – এগুলো কেবলমাত্র মতাদর্শিক বা উপরিকাঠামোগত বিষয় হয়েই সীমাবদ্ধ নেই।

পশ্চিমকে এরূপে অধ্যয়নের বিষয়বস্তুতে পরিণত করার ক্ষেত্রে পশ্চিমের গড়ে তোলা দুটি বাস্তবতার সবিস্তারে বিশ্লেষণের পক্ষপাতি রাবিনাউ। এক, জ্ঞানতত্ত্ব; এবং দুই, অর্থনীতি। তাঁর মতে, এপিস্টেমোলোজি বা জ্ঞানতত্ত্বকে অবশ্যই দেখতে হবে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে; এটি একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক অনুশীলন, যেটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে সপ্তদশ শতকের ইউরোপে। তেমনি *অর্থশাস্ত্রও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা - ইউরোপের নির্দিষ্ট ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সামাজিক অনুশীলন হিসেবে এটি গড়ে উঠেছে*। আর যেহেতু এটি সামাজিক অনুশীলন হিসেবে বিকশিত হয়েছে সেহেতু এর গাঠনিক উপাদান হিসেবে থেকেছে একটি 'রেজিম অব ট্রুথ', বস্তুত ফুকোর অনুসরণে রাবিনাউ বলেন প্রতিটি সামাজিক অনুশীলনকে বোঝার ক্ষেত্রে এর সক্রিয় গাঠনিক উপাদান হিসেবে 'রেজিম অব ট্রুথ'কে দেখা জরুরী। অর্থনীতি যে মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ বা অনুমিতিগুলোকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে আধিপত্য তৈরি করেছে, নিজের 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিভঙ্গির 'শ্রেষ্ঠত্ব' অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গিকে ছাড়িয়ে উপরে তুলে ধরেছে এবং এভাবে নিজের বুনিয়াদি সত্যগুলোকে বিশ্বজনীন ও প্রশ্নাতীত বাস্তবতা হিসেবে তুলে ধরেছে সেগুলোকে বোঝার ক্ষেত্রে ফুকোর 'রেজিম অব ট্রুথ'সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করা রাবিনাউ এর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *এতে করে দেখা সম্ভব যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অর্থশাস্ত্রীয় সত্যগুলো গড়ে উঠেছে।* অন্যভাবে বললে: অর্থনীতির সত্যগুলো বাস্তবিক পক্ষে বিশ্বজনীন বা প্রশ্নাতীত না হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো 'স্বাভাবিক' সত্য হয়ে উঠেছে– এটা সম্ভব হয়েছে আধিপত্যের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। ক্ষমতা-রাজনীতি ও শাসন-নিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট ব্যবস্থার অংশ হওয়ার কারণেই এটি মানব প্রকৃতি ও আচরণকে সংকুচিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্যে প্রভাব হয়েছে বহুক্ষেত্রেই বিপজ্জনক ও বিভ্রান্তিকর।

এভাবে ফুকোর বিশ্লেষণকে অনুসরণ করে এটি স্পষ্ট করা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট চিন্তা বা চিন্তা-ব্যবস্থার জ্ঞানজাগতিক আধিপত্যকে অথবা কোনো বিদ্যা-শাস্ত্রের দাপটকে একাডেমিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য হিসেবে বিছিন্নভাবে বোঝার সুযোগ নেই। একাডেমিতে সেই সত্য এবং সেই বাস্তবতারই দাপট দেখা যায় যেই সত্য ও বাস্তবতা 'পাওয়ার-রেজিম' কর্তৃক উৎপাদিত ও সমর্থিত। জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে অর্থনীতির আধিপত্যকেও এই বিশ্লেষণী কাঠামোর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়।

এসকোবার উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে বলেছেন কেবল ১৯৪৫ সালের পরে উন্নয়ন ডিসকোর্স হিসেবে কিভাবে বিকশিত হয়েছে সে আলোচনাই উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ বোঝাপড়ার জন্য যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যে বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে এটির আবিষ্কার ঘটে তারও বহু পূর্ব থেকে বিরাজমান অনেকগুলো বিষয়ের সাথে উন্নয়ন যুক্ত। এর মাঝে তার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: পশ্চিমা অর্থনৈতিক চর্চা ও অর্থনৈতিক যুক্তিশীলতার গড়ে ওঠা (formation of Western economic rationality)। এসকোবারের মতে এই চর্চা ও যুক্তিশীলতার বিকাশ ঘটে মানুষকে অর্থনৈতিক মানুষ বা *হোমো ইকোনোমিকাস* হিসেবে পশ্চিমের নির্মাণ ও উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই। এই নির্মাণ পশ্চিম কেবলমাত্র নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি, তাকে সম্প্রসারিত করেছে তৃতীয় বিশ্বেও। এসব চর্চার নির্মাণ ও সম্প্রসারণই উন্নয়ন অর্থশ্রাস্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে ফুকোর অনুসরণে এসকোবার 'জিনিয়ালজি অব ডেভেলপমেন্ট' তৈরি করার কথা বলেন, এর সাথে মাজিদ রাহনেমার 'জিনিয়ালজিক্যাল প্রোফাইল অব হোমো ইকোনোমিকাস' সংক্রান্ত আলোচনা যুক্ত করা যেতে পারে।

এসকোবার অবশ্য বিশ্লেষণী কাঠামোকে আরও সম্প্রসারিত করার পক্ষপাতি। তাঁর মতে এ বিষয়গুলোকে দেখা উচিত বৃহত্তর অর্থে পশ্চিমা সংস্কৃতির মাঝে নির্দিষ্ট আচরণ ও চর্চার অধিকারী মানুষজনের বেড়ে ওঠা হিসেবে। পুঁজিবাদকে কেবলমাত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার দিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, বরং একে দেখা যেতে পারে পশ্চিমা আর্থব্যবস্থার প্রকাশক হিসেবে। এই পশ্চিমা অর্থনীতি অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে তিনটি ব্যবস্থার সম্মিলন হিসেবে গড়ে ওঠে। ব্যবস্থাগুলো হলো: নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদনের ব্যবস্থা (বৃহত্তর অর্থে পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনীতি), নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষমতার ব্যবস্থা (শাস্তিমূলক ও স্বাভাবিকীকরণের কৌশলসমূহ), নির্দিষ্ট অর্থ নির্মাণ ব্যবস্থা (মতাদর্শ, বিজ্ঞান, পরিবেশনা, যার মধ্যে রয়েছে উদারনৈতিকতাবাদ ও উপযোগবাদের মতো দার্শনিক ধারাসমূহ এবং শ্রম ও উৎপাদনের ধারণাকে ঘিরে প্রবল কিছু নিয়ম-নীতি)। এভাবে ব্যবস্থাসমূহের সম্মিলিত নির্মাণ হিসেবে পশ্চিমা আর্থব্যবস্থার প্রকৃতিকে বোঝা যায়। বাকী বিশ্বে এই আর্থব্যবস্থার সম্প্রসারণ কিভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তা-ও এখান থেকে বোঝা যেতে পারে।

আজকের যে সকল প্রবল অর্থনৈতিক চর্চাগুলো রয়েছে সেগুলো যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধীরে পশ্চিমা সমাজের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে উঠেছে সেটি এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। স্বাভাবিক, স্বচ্ছ, যৌক্তিক আচরণ বলতে কী বোঝানো

হবে সে বিষয়ে যে অর্থনৈতিক ঐক্যমত পশ্চিমে তৈরি হয়েছে সেটিকেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এ অবস্থান থেকেই।

এসকোবারের মতে, পল রাবিনাউ-এর প্রস্তাবনা অনুসরণে পশ্চিমের নৃবৈজ্ঞানিকীকরণের ক্ষেত্রে এই *অর্থনৈতিক মানুষ* কোন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় নির্মিত হয়েছে তা বোঝা জরুরী। নির্দিষ্ট ধরনের যুক্তিশীলতা, পুঁজিবাদের সূত্রসমূহ এবং নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত কাম্য ব্যক্তি-মানুষের প্রতিরূপ হচ্ছে এই *হোমো ইকোনোমিকাস*। আধুনিকতা নামক ইউরোপীয় অভিজ্ঞতাকে বিশ্বজনীন করার ফলাফল হলো দুনিয়াজোড়া এই অভিন্ন ধরনের যুক্তিশীল অর্থনৈতিক ব্যক্তি মানুষের আদর্শকে বলবৎ করা। তাঁর মতে, উন্নয়নবাদকে বুঝতে গেলে এই *অর্থনৈতিক মানুষ* সংক্রান্ত পশ্চিমা ধারণাকে মোকাবেলা না করার গত্যন্তর থাকে না। বস্তুত উন্নয়ন ডিসকোর্সের সংকট বহুলাংশে অর্থনীতি জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত সংকটেরই প্রতিফলন।

উপসংহার

অর্থশাস্ত্রের পূর্বানুমান, স্বতঃসিদ্ধ বা তাত্ত্বিক মডেলসমূহকে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ও সামাজিক চর্চার পরিসরে সেগুলো নিশ্চয়ই প্রসঙ্গিক। কিন্তু এই চিন্তাব্যবস্থাকে যেভাবে অখণ্ড সত্য কিংবা বিশ্বজনীন মডেল রূপে পরিবেশন করা হয়েছে তার ফলাফল দুনিয়ার নানা অংশের মানুষেরা নিজেদের জীবনে মর্মন্তদভাবে মূর্ত হতে দেখেছে। উন্নয়ন, বাজার আর ব্যক্তি স্বার্থ কেন্দ্রিকতার পশ্চিমি মডেলের বুদ্ধিবৃত্তিক বৈধতা এসেছে এই বিশেষ ধরনের জ্ঞান ব্যবস্থার ভেতর থেকে। চিন্তা ও চর্চার এই বিশেষ ধরনকে সমস্যায়িত করার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে পরিচালিত বিভিন্ন সমালোচনাকে ভিত্তি করে একটি সংহত অবস্থান গ্রহণ জরুরী বলে এ লেখায় আমি দেখাতে চেয়েছি।

মানব আচরণ অবশ্যই অর্থনৈতিক সমস্যা দিয়ে সীমায়িত, কিন্তু সেই 'অর্থনৈতিক' সমস্যাকে পশ্চিমা বাজার ভিত্তিক সভ্যতার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে যেভাবে পরিবেশন করা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই প্রতিটি সমাজ ও সংস্কৃতির নিজস্ব বাস্তবতাকে নিদারুনভাবে অস্বীকার করে। প্রতিটি 'বাস্তব মানুষ' তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্যে তার নিজস্ব অতীত, নিজস্ব শিক্ষা ও বোধ-বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং নিজস্ব চর্চা বা অনুশীলনের কাঠামো স্থির করে। অভিজ্ঞতা ও চর্চার এই ধরন দুনিয়া জোড়া অভিন্ন নয়। ফলশ্রুতিতে ভিন্ন

ভিন্ন বাস্তবতায় মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করে। এমনকি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একচ্ছত্র বিস্তৃতির কালেও মানুষদের নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার, নিজেদের মতো করে প্রয়োজন স্থির করার এবং নিজেদের স্বতন্ত্র পন্থায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন বোনার অধিকার স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক। ভোগবাদী মুনাফার বাসনাকে চিরন্তন, স্বাভাবিক ও অনিবার্য হিসেবে পরিবেশন করা এবং অসীম অভাবের হাহাকারকে মানুষের চেতনায় অখণ্ডভাবে বপন করার মধ্য দিয়ে অর্থনীতি মানুষের আচরণ ও সামাজিক সম্পর্কের এই বিবিধতার গুরুত্বহানি ঘটায়। দৃষ্টিভঙ্গির অতি সাধারণীকরণের ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির বহুমুখী বাস্তবতা তাত্ত্বিক প্যারামিটারের বাইরে থেকে গেছে।

প্রতিটি সংস্কৃতির নিজস্ব জীবন ধারনের ব্যবস্থা রয়েছে– এর মানে হলো প্রতিটি সংস্কৃতির নিজস্ব আর্থ ব্যবস্থাও রয়েছে। একক ও অখণ্ড অর্থনীতির মডেলকে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বজনীন বলে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে মানব আচরণ ও মানব প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট ধরনকে অন্য সকল ধরনের ওপর জোর পূর্বক চাপিয়ে দেয়ার সমতুল্য। বেঁচে থাকার লড়াই সংগ্রামে মানুষেরা অবশ্যই কৌশলী ও হিসেবী, কিন্তু এই কৌশল বা হিসাব-নিকাশের একক ও অখণ্ড ব্যবস্থাকে সত্য হিসেবে বলবৎ করে দেয়া হলে সেটি বিভিন্ন দেশ, সমাজ বা জনগোষ্ঠীর প্রকৃত প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখবার তাত্ত্বিক পরিসর তৈরি করে না। মানুষকে নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ডে স্বার্থপর ও মুনাফা-অন্বেষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে নির্মাণের মধ্য দিয়ে অর্থশাস্ত্রীয় জ্ঞান ও চর্চা মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে, প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতাকে আড়াল করে ফেলে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকে উদযাপনের জন্যই এ ধরনের সর্বব্যাপী সত্যের প্রবল উপস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ করা প্রয়োজন। একাডেমিক চর্চার মধ্যে সে বিভিন্নতার পরিসর তৈরি হয়ে থাকা বা তৈরি করে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ লেখায় বিশ্লেষণ ও বক্তব্য উপস্থাপনে সীমাবদ্ধতার দায়ভার পুরোটাই আমার। দীর্ঘদিন থেকে এ বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও পড়াশুনার সময়ে সহকর্মী ও বন্ধুদের অনেকের সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাঁদের সেসব আন্তরিক পর্যবেক্ষণের প্রতি সুবিচার করতে না পারার ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েই তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে আমার শিক্ষক ও সহকর্মী অধ্যাপক জহির আহমদ শেষ পর্যায়ে যেভাবে পুরো লেখাটি নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য দিয়েছেন সেটি না পেলে এ লেখা হয়তো কোনোদিন আলোর মুখ দেখতো না। নৃবিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক ও পত্রিকা নির্ধারিত অ-নামা রিভিউয়ারের প্রতিও অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার করি।

টীকা

১. ইংরেজি 'Economics' নামীয় শাস্ত্রটিকে বোঝানোর জন্য বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অর্থনীতি'-ই এ লেখায় ব্যবহার করা হয়েছে। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে 'অর্থশাস্ত্র'ও লেখা হয়েছে। এ দুটিই একই অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত। তবে 'economy' এর প্রতিশব্দ হিসেবেও অর্থনীতি লিখতে হয়েছে কোথাও কোথাও, সেক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বোঝানোর জন্য বন্ধনীতে ইংরেজি প্রতিশব্দটি রেখে দেয়া হয়েছে।

২. বস্তুত প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রের যে দাপট সেটি তার একাডেমিক দাপটকে স্পষ্ট করে। ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের প্রধান সমস্যাগুলো কী তা অর্থনীতির ফ্রেমওয়ার্কের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়ে আছে। ফলে এসব সমস্যার সুরাহা করার ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক চিন্তার ও অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হয়ে যায়। বস্তুত পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণে অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেছে অর্থনীতির পেশাজীবীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (professionalization and institutionalization)।

৩. তাত্ত্বিক কাঠামো সংক্রান্ত বিতর্কের প্রসঙ্গটি এখানে মুখ্যত উত্তরাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রেখে বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নবাদের কিছু তীব্র সমালোচনা তৈরি হয়েছে বহুলাংশে উত্তরাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে। কিন্তু আবাশ্যিকভাবে উত্তরাধুনিক অবস্থান থেকে না দেখলেও অর্থনীতির আধিপত্যকে সমস্যাজনক হিসেবে দেখা সম্ভব এবং সেভাবে দেখাও হয়েছে।

৫. *Homo Oeconomicus* বা অর্থনৈতিক মানুষ-এর ধারণা বর্তমানে নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি, বা বিশেষ করে এল. রবিন্সের সংজ্ঞার সাথে যুক্ত করে দেখা হলেও বস্তুতপক্ষে এ ধারণটি তৈরি হয় উনবিংশ শতাব্দীতেই। এর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল (Persky 1995), যদিও মিল 'অর্থনৈতিক মানুষ' পদটি সরাসরি ব্যবহার করেননি। অবশ্য এটাও ঠিক যে মিলের লেখায় অর্থনৈতিক মানুষের ধারণাটি যেভাবে এসেছে নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিতে ধারণাটি সেখান থেকে অনেক দূর সরে গেছে। এই নতুন ধারণার মূলতঃ দুটি উপাদান রয়েছে। এক, আত্ম-স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবৃত্তি; ও দুই, যুক্তিশীলতা।

৬. প্রতিবেশগত সংকটের মতাদর্শিক ও দার্শনিক উৎস অনুসন্ধান করতে যেয়ে অনেকে.(যেমন Shiva 1992; Rahnema 1992) দেখেছেন পুঁজিতান্ত্রিক ও শিল্পবাদী পশ্চিমা সভ্যতার যে প্রকৃতি-বিনাশী চরিত্র সেটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পশ্চিমা অর্থশাস্ত্রের মৌলিক অনুমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তথ্যসূত্র

Appaduri, Arjun (1989) Small-Scale Techniques and Large-Scale Objectives. In *Coversations Between Economists and Anthropologis,* ed. P. Bardhan: 250-582. Delhi: Oxford University Press

Appaduri, Arjun (1986) Introduction: Commodities and Politics of Value. In *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Pespectivs.* Edited by A. Appaduri. Cambridge: Cambridge University Press.

Bardan, Pranab (ed.) (1989) *Coversations between Economists and Anthropologist.* Delhi: Oxford University Press

Bourdieu, Pierre (1990)[1980] *The Logic of Practice.* UK: Polity Press

Bourdieu, Pierre (1977)[1972] *Outline of a Theory of Practice.* Cambridge: Cambridge University Press

Carrier, James G. and Daniel Miller (1999) From Private Virtue to Public Vice. In *Anthropological Theory Today.* edited by Henrieta L. Moore. UK: Polity Press

Escobar, Arturo (1988) Power and Visibility: Development and the Invention and Management of the Third World. In *Cultural Anthropology* 3(4): 428-43.

Escobar, Arturo (1995) *Encountering Development - The Making and Unmaking of the Third World.* Princeton: Princeton University Press

Esteva, Gusteva (1992) Development. In *Development Dictionary* edited by Wofgang Sachs. London and New York: Zed Books Ltd.

Focault, Michel (1973) *The Order of things.* New York: Vintage Books.

Focault, Michel (1980) Truth and Power. In *Power/Knowledge.* edited by Colin Gordon, 109-33. New York: Pantheon Books.

Gardner, K. and D. Lewis (1996) *Anthropology, Development and Post-modern Challenge.* London: Pluto Press.

Godelier, Mauric (1977[1973]) Perspectives in Marxist Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Godelier, Maurice (1986) *The Mental and the Material.* London: Verso

Grillo, R. (1985) Applied Anthropology in the 1980s: Retrospect and Prospect. In *Social Anthropology and Development Policy.* edited by R. Grillo and A. Rew. New York: Tavistock.

Gudeman, Stephen (1986) *Economics as Culture: Models and Metaphors of Livelihood.* London: Routledge and Kegan Paul.

Gudeman, Stephen and Alberto Rivera (1990) *Conversations in Columbia: The Domestic Economy in Life and Text.* Cambridge: Cambridge University Press.

Hill, Polly (1986) *Development Economics on Trial: An Anthropological Case for a Prosecution.* Cambridge: Cambridge University Press

Mauss, Marcell (1990)[1925] *The Gift.* London and New York: Routledge

Narotzsky, Susan (1997) *New Directions in Economic Anthropology.* Chicago: Pluto Press

Persky, Joseph (1995) Retrospectives: The Ethnology of Homo Economicus. In *The Journal of Economic Perspective*, Vol. IX No. 2.

Polanyi, Karl (1971)[1944] *The Great Transformation.* Boston: Beacon Press

Rabinow, Paul (1986) Representations are Social Facts: Modernity and Post-modernity in Anthropology. In *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography.* edited by James Clifford and George Marcus. 234-61. Barkley: University of California Press.

Rahnema, Majid (1997) Development and the Peoples Immune System: The Story of another Variety of AIDS. In *The Post-Development Reader* compiled and introduced by Majid Rahnem with Victoria Bawtree. Dhaka: UPL

Sachs, Wolfgang ed. (1992) The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. London: Zed Books

Sahlins, Marshal (1972) *Stone Age Economics.* Chicago: ALdine-Atherton Inc.

Schneider, H.K. (1974) *Economic Man.* New York: The Free Press.

Seymour-Smith, Charlotte (1986) *Macmillan Dictionary of Anthropology.* Macmillan.

Shiva, Vandana (1992) Resources. In *Development Dictionary* edited by Wofgang Sachs. London and New York: Zed Books Ltd.

Spencer, Jonathan (1996) Modernism, modernity and modernization. In Encyclpedia of Social and Cultural Anthropology. edited by Alan Barnard and Jonathan Spencer. London and New York: Routledge

Yanagishako, Silvia and Jane Collier (1989) *Gender and Kinship: Toward a Unified Analysis.* Stanford: Stanford University Press.